International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-XI, Issue-I, January 2025, Page No.01-09
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i1.001

প্রসঙ্গ অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা: হিউম ও কান্ট

সোহেল রানা
গবেষক, দর্শন ও জীবন-জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 29.11.2024; Accepted: 25.12.2024; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Metaphysics is one of the most important branches of philosophy. It deals mainly with the true nature or reality of things. In metaphysical discourse, the fundamental question is: Is metaphysics possible at all? Philosophers have given various answers to this question from different perspectives. In this paper, we have discussed the views of David Hume and Immanuel Kant on the possibility of metaphysics. In doing so, following Hume's An Enquiry Concerning Human Understanding (1748), firstly, we have discussed the distinction between two types of philosophy namely easy and obvious philosophy and abstruse philosophy; secondly, the distinction between two types of metaphysics consists of abstruse philosophy has been discussed. Further, following Immanuel Kant's Critique of Pure Reason (1781), the discussion has been made on the nature of pure reason, two types of metaphysics and their problems, conditions of pure knowledge etc. Lastly, a comparative discussion has been made between the views of Hume and Kant.

Keywords: Metaphysics, true and false metaphysics, mental geography, pure reason, transcendental Metaphysics.

ভূমিকা: পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬ খ্রী.) ও ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রী.) অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। দর্শনের শাখা হিসাবে অধিবিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। অধিবিদ্যা বস্তু বা বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে।[১] অধিবিদদের কী কাজ? কী পদ্ধতি অবলম্বন করে আলোচনা প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে - সে বিষয়ে ঐক্যতা পাওয়া যায় না। তবে অধিবিদ্যা মূলত যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু বা লক্ষ্য নিয়ে ধারণা গঠন করা যায়। যেমন - অধিবিদ্যা জগৎ কী? পরমসত্ত্বা কী? ব্যক্তির অভিন্নতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মা কী অমর, অজড়? কার্যকারণ সম্পর্ক, দেশ-কাল কী মনোনিরপেক্ষ সত্ত্বা? ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া বস্তু কি পরমসত্তার প্রকাশ? বস্তুবাদ ও প্রতিবস্তুবাদ (Realism and anti-Realism), ইচ্ছার স্বাধীনতা, জগতের অভিব্যক্তি যান্ত্রিক না উদ্দেশ্যমূলক, দেহ-মনের সম্পর্ক, সামান্যের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা

করে। বিদ্বজনেরা মনে করেন, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে এণ্ড্রনিকাস নামক জনৈক লেখক অ্যারিষ্টটল এর *First Philosophy* গ্রন্থটিকে সম্পাদন করতে গিয়েই Metaphysic শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। অ্যারিস্টটল 'First Philosophy' বলতে স্বরূপত সত্তা, সত্তা হিসাবে সত্তা (Being qua being) আলোচনাকে বুঝতেন। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে অধিবিদ্যার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দার্শনিক প্লেটো দুই জগতের কথা বলেছেন – ধারণার জগৎ ও ধারণার প্রতিনিধিস্বরূপ বিশেষের জগৎ। প্লেটো ধারণার জগৎকে অতীন্দ্রিয় এবং বিশেষের জগতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে মনে করেন। এই ধারণার জগৎকে শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল, দেশ-কালাতীত জগৎ বলে মনে করেন। অন্যদিকে বিশেষের জগৎকে চঞ্চল, পরিবর্তনশীল, দেশ-কালের জগৎ বলে অভিহিত করেন। প্লেটো মনে করেন, দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ধারণার জগতের স্বরূপ অনুসন্ধান করে তার আলোকে জীবন অতিবাহিত করা। শুধুমাত্র প্লেটো, অ্যারিষ্টটল নয়, আধুনিককালে অধিবিদ্যার উপর অনেক দার্শনিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন – স্পিনোজা, হেগেল, ব্রাডলি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দার্শনিক স্পিনোজা মনে করেন, বাহ্যজগৎ ও মনোজগতের মূলে এক অদ্বিতীয়, নিরাকার সত্ত্বাকে অনুসন্ধান করাই দার্শনিকদের প্রধান কাজ। এই পরমসত্তাকে তিনি দ্রব্য, ঈশ্বর ও প্রকৃতি নামে অভিহিত করেছেন। দার্শনিক হেগেলও পরমসত্তার অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। এই অনুসন্ধান দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করার কথা বলেছেন। তিনি আরো মনে করেন, 'বহুর মধ্যে এক' হল এই পরমসত্তা। ভাববাদী দার্শনিক ব্রাডলি মনে করেন, বাহ্যজগৎ স্বতঃ বিরোধপূর্ণ, যাবতীয় বিরোধের অবসান ঘটে এক জ্ঞানে উপনীত হওয়া – এটাই দার্শনিকগণের লক্ষ্য। তিনি বিরোধহীন এই জগতকে পারমার্থিক জগৎ বলে অভিহিত করেন। এছাড়া স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার, সেন্ট আগাস্টিন, জর্জ হেগেল, এফ. এইচ ব্রাডলি, জন ম্যাকটেগার্ট এবং ভারতীয় দার্শনিক আচার্য শঙ্কর, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রমুখ অধিবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বিখ্যাত অধিবিদ ফ্রান্সিস হারবার্ট ব্রাডলির মতে,

> We may agree, perhaps, to understand by metaphysics an attempt to know reality as against mere appearance, or the study of first principles or ultimate truths, or against the effect to comprehend the universe, not simplicity pieces or by fragments but same hood as whole.[২]

অর্থাৎ অধিবিদ্যা বলতে সকলেই ঐক্যমত হতে পারি যে অবভাসের অন্তরালে বস্তবতাকে জানার চেষ্টা, অথবা মূল সূত্রাবলি বা চূড়ান্ত সত্যের চর্চা করা, অথবা খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে সমগ্র দৃষ্টিকোণ থেকে জগতকে বোঝার চেষ্টা করা।

মানুষ সাধারণভাবে যে বস্তুগুলি অনুভব করে, তা অবভাস। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকেই প্রকৃত সত্তা বলে মনে করেন। সুতরাং কোনটি অবভাস, কি পরিমান অবভাস, সেই অবভাসে কী পরিমাণ সত্তা রয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা করে অধিবিদ্যা। আসলে অবভাস থেকে সত্তাকে পৃথক করা অধিবিদ্যার কাজ। সুতরাং অধিবিদ্যা সত্তা ও অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

অধিবিদ্যার সমস্যার সমাধান না হলে অন্যান্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। যেমন – সংখ্যা কী বাস্তব সম্মত না তা কেবল কল্পনাত্মক এইরূপ আলোচনা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত গাণিতিক অনুসন্ধান করা ফলপ্রসূ হয় না। এই রূপ সমস্যাগুলো মৌলিক। অন্যদিকে বিজ্ঞানীগণ বিশেষ বা সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিজ্ঞানীগণ এই জগতের জড়প্রকৃতি পারমানবিক গঠন

নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু জড় অতিরিক্ত চৈতন্য বিষয়ে উদাসীন। এই অধিবিদ্যা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুর সমগ্র স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চাই।

অধিবিদ্যা কোন কিছুকে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করে না। কিন্তু বিজ্ঞান কিছু সূত্র বিনা প্রমাণে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মে তাদের প্রয়োগ করেন। কিন্তু অধিবিদ্যায় 'অধিবিদ্যা কী প্রকৃতপক্ষে সম্ভব? এই প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করে। অর্থাৎ অধিবিদ্যায় বিষয়গুলির যার্থাথ্য বিচার করা হওয়ায় সেগুলিকে সত্য বলে মনে করা হয়।

অধিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'অধিবিদ্যা কী প্রকৃতপক্ষে সম্ভব' এই বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বা দার্শনিক সম্প্রদায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধে মূলত ডেভিড হিউম ও ইম্যানুয়েল কান্ট অধিবিদ্যাকে কীভাবে দেখেছেন – সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ডেভিড হিউমের মতে অধিবিদ্যা: অযথার্থ অধিবিদ্যা বর্জন করার জন্য ও এটি নিষ্ফল তা প্রমাণ করার জন্য প্রথম অধ্যায় 'Of the different species of philosophy' তে দুই প্রকার দর্শনের কথা বলেছেন। [৩]

ক. সহজ ও সুবোধ্য দর্শন (easy and obvious philosophy)
খ. জটিল ও গূঢ় দর্শন (abstruse philosophy)

এই দুই প্রকার দর্শনের মধ্যে তুলনা করলে বিভিন্ন পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম প্রকার দর্শনে মানুষকে কর্মপ্রবণ প্রাণী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই প্রকার দর্শন মানুষের সদগুণ নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই দর্শনের ফলে মানুষের আচরণ প্রভাবিত হয়। এছাড়া সমাজে বসবাসকারী মানুষ ও তাদের নানা রকম সমস্যা নিয়ে এই দর্শন আলোচনা করে। এছাড়া সমাজের মানুষের উপযোগী হওয়ার জনপ্রিয়, স্থায়ী ও ব্যবহারিক। এছাড়া যদি এই দর্শনের আলোচনার কোন স্তরে ভুল হয়ে যায়, তাহলে সহজেই তা সংশোধন বা সমাধান করা সম্ভব। দ্বিতীয় প্রকার দর্শনে মানুষকে চিন্তাশীল প্রাণী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই প্রকার দর্শনে চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে যাতে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই প্রকার দর্শন সহজ ও সুবোধ্য দর্শনকে যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সাহায্যে করে। এছাড়া এই দর্শনের খ্যাতি ক্ষণস্থায়ী, সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত না এবং এই দর্শনের কোন স্তরে ভুল হলে সেটা পরবর্তী স্তরে সেই ভুল লক্ষ্য করা যায়।

হিউম দুটি চরমপন্থী মতবাদের সমন্বয় সাধনের কথা বলেছেন। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। তাই বিচার-বিশ্লেষন করার মাধ্যমে সে মানসিক পুষ্টি লাভ করে। তবে শুধুমাত্র বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে মানুষের উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতার সৃষ্টি হয়। আবার মানুষ সক্রিয় জীব। তাই সে কর্মপ্রবণ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তাই মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার পক্ষে হিউম বক্তব্য পেশ করেন এবং তাঁর দর্শন হবে সমাজ কল্যাণমূলক। তিনি বলেন, 'Be a philosopher; but amidst all your philosophy, be still a man.' [৪] অর্থাৎ তুমি যদি দার্শনিক হতে চাও কোনরকম সমস্যা নেই, তবে তোমার দর্শন আলোচনার মধ্যে দিয়ে যেন তোমার সঙ্গে মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক অটুট থাকে।

হিউম যে দুইপ্রকার দর্শনের কথা বলেছেন দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ জটিল ও গূঢ় দর্শনকেই তিনি 'অধিবিদ্যা' বলেছেন।[৫] তিনি যে অযথার্থ অধিবিদ্যা বর্জন করার কথা বলেছেন তা তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়। তিনি বলেছেন, "If we take in our hand any volume of divinity or school

Metaphysics, for instance, let us ask: Does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No. Commit it then to the flames: for it can contain nothing but sophistry and illusion."[৬] অর্থাৎ গ্রন্থাগারে গিয়ে কোন গ্রন্থ নিয়ে দেখা হল গ্রন্থটিতে সংখ্যা বা পরিমান নিয়ে কোন বিশুদ্ধ যুক্তি নেই। তাহলে আবার দেখা হল বাস্তব সত্য ও ব্যাপার বিষয়ক অনুভবাত্মক যুক্তি নেই। তাহলে গ্রন্থটিকে আগুলে আহুতি দিতে হবে, কেননা এক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও কুতর্ক ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না।

হিউমের মতে দুই প্রকার জ্ঞান সম্ভব, গণিত যুক্তি বিজ্ঞানের মত বিমূর্ত সংখ্যা ও পরিমাণ সংক্রান্ত সুনিশ্চিত জ্ঞান ও ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির মত অস্তত্ব ও বস্তুস্থিতি সংক্রান্ত সম্ভাব্য জ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞান সম্ভব। বাকী সব কিছু ভ্রান্তি ও কুতর্ক অর্থাৎ এখানে অযথার্থ অধিবিদ্যাকে বোঝানো হচ্ছে।

এইজন্য হিউম যথার্থ অধিবিদ্যার দুটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন – ক. অধিবিদ্যা জ্ঞানের সীমা নির্দেশ করে সত্যের সঙ্গে অভিনবত্বের যোগসাধন করা।[৭] খ. Abstruse philosophy ভিত্তিকে বিনষ্ট করা।[৮]

সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে ডেভিড হিউম অধিবিদ্যাকে খণ্ডন করেছে, তাই তাঁর কাছে অধিবিদ্যা অসম্ভব। কিন্তু হিউমের *An Enquiry Concerning Human Understanding* গ্রন্থে প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকার অধিবিদ্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে। যথার্থ অধিবিদ্যা ও অযথার্থ অধিবিদ্যা। তিনি মনে করেন, অযথার্থ অধিবিদ্যা ভুল-ভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তার উৎস। সেইজন্য তিনি যথার্থ অধিবিদ্যাকে অযথার্থ অধিবিদ্যা থেকে পৃথক করতে চান এবং যথার্থ অধিবিদ্যার একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন, মানুষ সব কিছু জানতে পারে – এই উগ্র মনোভাবের জন্য এই অযথার্থ অধিবিদ্যার উদ্ভব হয়। এছাড়া অনেক সময় অপযুক্তির সাহায্যে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই অযথার্থ অধিবিদ্যা থেকে মুক্ত লাভ করতে হলে কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। হিউম তাঁর *Enquiry* গ্রন্থের মূল লক্ষ্য হিসাবে মনে করেন মানুষের মনে একটি মানচিত্র (Mental Geography) অঙ্কণ করা। অর্থাৎ মানুষের শক্তি সামর্থ্যের সীমানা নির্ধারন করা। ফলে কোন বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত এবং কোন বিষয় সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত সেই সম্পর্কে উপলব্ধি হওয়া সম্ভব। সেই সীমার বাইরে কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে না। কেননা, সেগুলি আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অনুরূপভাবে সেই সীমার মধ্যে আলোচিত কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়ায় সঠিক জ্ঞান প্রদান করতে পারে। অযথার্থ অধিবিদ্যা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা মানুষের মানসিক সামর্থ্যের বাইরে। সেইজন্য অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় কুসংস্কারে পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। এছাড়া এইরূপ আলোচনায় বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দেখা যায়।

এই জন্য হিউম মনে করেন, অযথার্থ অধিবিদ্যা থেকে যথার্থ অধিবিদ্যাকে পৃথক করা প্রয়োজন। এইজন্য হিউম দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন -

ক. সুনির্দিষ্ট ও সঙ্গত যুক্তি (accurate and just reasoning) [৯]
খ. মানসিক শক্তি সামর্থ্যের সীমানা নির্ধারণ।[১০]

এতদিন অধিবিদ্যা সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে পারেনি। এটা থেকে কখনো নিঃসৃত হয় না যে, অধিবিদ্যা কোনভাবেই সঠিক বা সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে পারবে না। তিনি মনে করেন, মিথ্যা বা

অযথার্থ অধিবিদ্যা থেকে যথার্থ অধিবিদ্যাকে যত্ন সহকারে চর্চা করলে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে।[১১] তাই তিনি অধিবিদ্যাকে বর্জন না করে যত্ন সহকারে অধিবিদ্যক অনুসন্ধান করা উচিত বলে মনে করেন।

হিউম জ্যোর্তিবির্দ্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, জ্যোর্তিবিদ্যা বিজ্ঞানরূপে পদবাচ্য অর্থাৎ তার বক্তব্য সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে অধিবিদ্যার ক্ষেত্রেও সত্য জ্ঞান পাওয়া উচিত বলে মনে করেন।

গূঢ় দর্শন বা অধিবিদ্যা সাধারন মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাই। তবে হিউম অধিবিদ্যার সমর্থনে কিছু যুক্তি প্রদান করেছে। সেগুলি হল –

সরল ও সংবেদনশীল দর্শনের ভিত্তি হল এই জাতীয় গূঢ় দর্শন বা অধিবিদ্যা। অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল না হলে রসবোধ তৈরি করে না, সঠিক কর্মোপদেশ দিতে পারে না, যুক্তিযুক্তভাবে গ্রহণ করা যায় না। [১২] যেমন – কোন চিত্র অঙ্কন করতে হলে অঙ্গ- প্রতঙ্গ, পেশি বিন্যাস, পেশি সঞ্চালন ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই অধিবিদ্যা ছাড়া স্পষ্টতা জ্ঞান পাওয়া যায় না।

এই জাতীয় জ্ঞানচর্চা রাজনীতিবিদকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে সাহায্য করে, আইনজীবিদের তার যুক্তিকে শৃঙ্খলা আনতে সাহায্য করে এবং সুষ্ঠতর সূত্র আবিষ্কার করতে সহায়তা করে, সেনাপতিকে সতর্ক করে- এইভাবে সাহায্য করে।[১৩]

এই অধিবিদ্যার কোন উপযোগিতা না থাকলেও কৌতুহলের বিষয় হত। এই অধিবিদ্যার মাধ্যমেই নির্মল আনন্দলাভ সম্ভব।[১৪] এইভাবে হিউম অযথার্থ অধিবিদ্যাকে বর্জন করা সত্ত্বেও অধিবিদ্যার কিছু উপযোগিতা তুলে ধরেছেন।

ইমানুয়েল কান্টের মতে অধিবিদ্যা: পাশ্চাত্য দর্শনে একজন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হলেন ইমানুয়েল কাণ্ট। তাঁর বিখ্যাত তিনটি গ্রন্থের মধ্যে একটি হল *Kritik der reinen vernunft* (১৭৮১) এটি সমগ্র বিশ্বে *Critique of Pure Reason* বা প্রথম ক্রিটিক নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে তিনি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সমীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির জ্ঞানের সীমা পরিসীমা, উৎস, শর্ত অনুসন্ধান করেছেন এবং অতিবর্তী বা transcendent অধিবিদ্যা কী বিজ্ঞানরূপে গণ্য হওয়া সম্ভব? এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই transcendent অধিবিদ্যা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যেমন – ঈশ্বর, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মা ইত্যাদি।

তিনি বলেন, একটা সময় অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের রাণি বলে মনে করা হতো।[১৫] কিন্তু অধিবিদ্যার সেই মর্যাদা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে আর নেই। কেননা, অধিবিদ্যা পূর্বতঃসিদ্ধ উপায়ে জগৎ ও জীবনের মূলসূত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছিল। কিন্তু অধিবিদ্যা সেই বিষয়ে অসফল হয়।

অধিবিদ্যার এই অসফলতার জন্য নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদকে দায়ী করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক সময় অধিবিদ্যা নির্বিচারবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। তারা মনে করত, মানুষের প্রজ্ঞার ক্ষমতা সর্বব্যাপক এবং সমস্ত কিছু জানতে ও উত্তর দিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে তাঁরা মানুষের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ক্ষমতা বিচার-বিশ্লেষণ না করেই এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করত। এই সময় অধিবিদ্যা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে পূর্বতঃসিদ্ধ উপায়ে জগৎ ও জীবনের মূলসূত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে চাইত। জগতের মূলসূত্র কী? আত্মা কী অমর? ঈশ্বর কী অস্তিত্বশীল? ইত্যাদি এইরূপ আলোচনা করে অধিবিদগণ কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্বে উপনীত হতে পারেন নি। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পর বিরোধি তত্ত্বে উপনীত হন।

এইভাবে নির্বিচারে সবকিছু গ্রহণ করার ফলে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায়। এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে সংশয়বাদ নামক মতবাদের উদ্ভব হয়। এরা সকল নিয়ম বা মতকে সংশয় করতে শুরু করেন। অভিজ্ঞতাবাদীগণ সাধারণভাবে সংশয়বাদী হিসাবে চিহ্নিত হন। তাঁরা মনে করে থাকেন, বস্তুগতভাবে কোন ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করতে পারে না; তাদের জ্ঞান ব্যক্তিগত। ফলে জ্ঞানরাজ্যে এক অরাজকতার উদ্ভব হয়।

আধুনিককালের দার্শনিক, জন লক মনে করেন অধিবিদ্যক ধারণাগুলির উৎস হিসাবে সাধারণ অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করলে এই সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটে। এটি তিনি বুদ্ধিবৃত্তির অনুসন্ধানের ভিত্তিতে করেছেন।[১৬] কিন্তু কান্ট এরূপ মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। ফলে অধিবিদ্যা পুণরায় নির্বিচারবাদী চিন্তাধারায় উপনীত হয়। ফলে সাধারন মানুষের অধিবিদ্যা সম্পর্কে এক উদাসীন্য মনোভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু কান্ট এই উদাসীন্য মনোভাবকে গ্রহন করেন নি। তিনি মনে এর ফলে অধিবিদ্যা এবং অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানগুলি ক্ষতির সম্মুখীন হন। কান্ট মনে করেন, সকল কিছুকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

এবার আলোচনা করা হবে মানব প্রজ্ঞা কীভাবে অতিবর্তী অধিবিদ্যার দিকে অগ্রসর হয়? কান্ট মনে করেন, মানবপ্রজ্ঞা স্বরূপত অধিবিদ্যক হওয়ায় কতকগুলি অধিবিদ্যক প্রশ্ন মানব প্রজ্ঞার কাছে উপস্থিত হলে সেগুলি প্রজ্ঞা কোনভাবে উপেক্ষা করতে পারে না। এই প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে মানবপ্রজ্ঞার কাছে উপস্থিত হয়। কিন্তু মানব প্রজ্ঞার কাছে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে।[১৭] বাহ্যজগতে যে সব ঘটনা ঘটে, মানব প্রজ্ঞা সেই সব ঘটনাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করে। যেমন – দুটি ঘটনাকে অসংখ্যবার বারবার পরপর ঘটতে দেখলে অভ্যাসজাত প্রত্যাশার ফলে একটি ঘটনা ঘটতে দেখলে অন্য ঘটনা দেখার প্রত্যাশা ঘটে। এই দুটি ঘটনাকে যথাক্রমে কারণ ও কার্য বলে অভিহিত করি। মানবপ্রজ্ঞার অন্তরীক্ষে যে 'কার্যকারণের' নীতি রয়েছে তা বাহ্য জগতে প্রয়োগ করে। কিন্তু একটা সময় এই কার্য-কারণ নীতিকে সার্বিক নীতিতে পরিণত করে এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানবপ্রজ্ঞা সমস্ত ক্ষমতাকে অতিক্রম করে থাকে। সার্বিক কার্য-কারণ নীতি অনুসারে সকল কার্যের কারণ থাকে। অনুরূপভাবে মানবপ্রজ্ঞা মনে করে, জগৎ কার্য হওয়ায় জগতেরও কারণ রয়েছে। মানব প্রজ্ঞার কাছে স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে জগৎ উৎপত্তির কারণ কী? এইরূপ অধিবিদ্যক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিন্তু মানব প্রজ্ঞা এই প্রশ্নের উত্তর স্বাভাবিকভাবে প্রদান করতে পারে না।[১৮] প্রজ্ঞা এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন কল্পনার সাহায্যে উত্তর প্রদানে সচেষ্ট হয়। ফলে বিভিন্ন অধিবিদ বিভিন্ন কল্পনাকে আশ্রয় করে উত্তর প্রদানে সচেষ্ট হন। এইভাবে বিভিন্ন অধিবিদ বিভিন্ন উত্তর প্রদান করেন, তা অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে যাচাই করা সম্ভব না হওয়ায় কোনটি সঠিক বা কোনটি বেঠিক তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা পরস্পর বিরোধী মতবাদে উপনীত হয়। ফলে অধিবিদ্যা যেন 'এক নকল যুদ্ধক্ষেত্র' হিসাবে পরিণত হয়।[১৯] এই ধরনের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সংক্রান্ত অধিবিদ্যাকে অতিবর্তী অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়।

অধিবিদগণ মনে করেন, বুদ্ধির দ্বারা জগতের সত্য উদঘাটন করা যায়। কিন্তু অধিবিদগণ বুদ্ধির সীমারেখা নির্ণয় না করেই বুদ্ধির প্রয়োগ করে থাকেন। নম্রভাবে কান্ট স্বীকার করেন, এই প্রচেষ্টা তার ক্ষমতার বাইরে।[২০] বুদ্ধির যেখানে বৈধ প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে বুদ্ধির প্রয়োগ না করে বুদ্ধি প্রয়োগের সীমারেখার বাইরে বুদ্ধির অবৈধ প্রয়োগ করা হয়। ফলে অতিবর্তী অধিবিদ্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।

বুদ্ধির প্রয়োগ সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার জগতে প্রয়োগ করা হয় তাহলে কোন রকম সমস্যা দেখা যায় না, সেখানে সত্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু যদি বুদ্ধিকে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেখানে বিভিন্নরূপ পরস্পর বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে কোনরূপ সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভাব হয় না। যেমন – 'আত্মা অমর' ইত্যাদি বিষয় সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার জগতের বাইরের বিষয়। এক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োগ করা হলে কেউ বলবেন, আত্মা অমর আবার কেউ বলবেন আত্মা মরণশীল। এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মতবাদের উদ্ভব হওয়ায় এক্ষেত্রে কোন সত্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কান্টের মতে বুদ্ধি সবসময় একই থাকে, কখনো কম বা বেশি থাকে না। কিন্তু হেগেল মনে করেন, বুদ্ধি কম থেকে বেশির দিকে যায় এবং এর মধ্যে স্ববিরোধীতা থাকে। তিনি মনে করেন, বাদ (Thesis), প্রতিবাদ (anti-thesis) এবং সম্বাদ (Synthesis) এর মধ্যে দিয়ে বুদ্ধির অগ্রগতি সম্ভব হয়ে থাকে। তবে কান্ট ও হেগেল উভয়েই মনে করেন, শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা থাকে না।

এই পর্যন্ত যে অধিবিদ্যার কথা মূলত আলোচনা করা হয়েছে তা হল Transcendent metaphysics বা অতিবর্তী অধিবিদ্যা। Transcendent metaphysics ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।[২১] যেমন – ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি বিষয়। এই সকল বিষয়ে স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়। কান্ট এই ধরণের অধিবিদ্যাকে বর্জন করার কথা বলেছেন। কিন্তু কান্ট একধরনের অধিবিদ্যার আলোচনার কথা স্বীকার করেছে। সেই অধিবিদ্যা হল Transcendental metaphysics, এই ধরনের অধিবিদ্যায় জ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার যেসব পূর্বতঃসিদ্ধ শর্ত রয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা করে।[২২] Transcendental Philosophy অর্থাৎ যেগুলি অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তি হয়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার আবশ্যিক শর্তরূপে থাকে এবং এগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ উপাদান। পূর্বতসিদ্ধ সকল প্রকার জ্ঞানের নিয়মাবলী বা স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। এটি সম্ভব হয় বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারের মাধ্যমে। এই পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলতে পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক ও পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক উভয় জ্ঞানের কথা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া Transcendental metaphysics পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের শর্ত নিয়ে আলোচনা করে বলে সেগুলির মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা থাকে না এবং বুদ্ধির নিজ স্বরূপ থেকেই এই শর্তগুলোকে আবিষ্কার করা সম্ভব। কান্ট এই ধরনের অধিবিদ্যাকে Metaphysics of Nature বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩]

সুতরাং কান্ট Transcendental metaphysics কে গ্রহণ করেছেন এবং সেই সম্পর্কে আলোচনা করার পক্ষে আগ্রহী। এছাড়া তিনি ঈশ্বর, আত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সম্ভাবনা স্বীকার না করলেও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন।[২৪] তিনি আরো মনে করেন, অধিবিদ্যক প্রশ্ন সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রবণতা থাকায় অধিবিদ্যাকে বর্জন করা উচিত না।[২৫]

উপসংহার: পরিশেষে হিউম ও কান্টের অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তুলনা করলে যে সব বিষয়গুলি উঠে আসে, সেগুলি হল –

হিউম ও কান্ট উভয়েই মানসিক সামর্থ্যের সীমানা নির্ধারণ বা মানসিক মানচিত্রের (Mental Geography) সীমানা নির্ধারণের কথা বলেছেন। অর্থাৎ কোন বিষয় আমরা জানতে পারি, কোন বিষয়ে আমরা জানতে পারি না, সেই সম্পর্কে জানা প্রয়োজন বলে মনে করেন। উভয়েই মানুষের জ্ঞান সামর্থ্যের

বা সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে অধিবিদ্যক কোন বিষয়ে আলোচনা করা হলে তা অযথার্থ বা অপ অধিবিদ্যায় পর্যবসিত হয় বলে মনে করেন।

হিউম ও কান্ট উভয়েই যথার্থ অধিবিদ্যাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই যথার্থ অধিবিদ্যাকে সবসময় অপ অধিবিদ্যা বা অযথার্থ অধিবিদ্যা থেকে মুক্ত রাখার কথা বলেছেন। তবেই সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ সম্ভব বলে মনে করেন।

হিউম ও কান্ট উভয়েই অধিবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন নি। হিউম যথার্থ অধিবিদ্যাকে যত্নসহকারে অনুশীলনের কথা বলেছেন। তিনি অযথার্থ বা অপ অধিবিদ্যাকে বর্জনের কথা বলেছেন। অন্যদিকে কান্টও Transcendent বা অতিবর্তী অধিবিদ্যাকে বর্জন করার কথা বলেছেন এবং Transcendental metaphysics কে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। ঈশ্বর, আত্মা সম্পর্কিত অধিবিদ্যা অর্থাৎ Transcendent metaphysics (অতিবর্তী অধিবিদ্যা) কে স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে স্বীকার করলেও বিজ্ঞানরূপে এই অধিবিদ্যা অসম্ভব বলে মনে করেন।

তথ্যসূত্র:

১. সিনহা, যদুনাথ. *ইন্ট্রোডাকসন্ টু ফিলোসফি.* কলকাতাঃ নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০১৪, পৃ. ১৫।
২. ব্রাডলি, এফ. এইচ. *অ্যাপিয়ারেন্স এণ্ড রিয়েলেটি এ মেটাফিজিক্যাল এসে.* নিউইয়র্কঃ সাউন সোনেসিচেন এণ্ড কোং, ১৯০৮, পৃ. ১।
৩. হিউম, ডেভিড. *অ্যান ইন্ক্যয়ারি কনসার্ননিং হিউম্যান আণ্ডারস্টানডিং.* কলকাতাঃ প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ. ৪৭।
৪. তদেব, পৃ. ৫০।
৫. তদেব, পৃ. ৫০।
৬. তদেব, পৃ. ১৯৪।
৭. তদেব, পৃ. ৫৬।
৮. তদেব, পৃ. ৫৬।
৯. তদেব, পৃ. ৫৩।
১০. তদেব, পৃ. ৫৪।
১১. তদেব, পৃ. ৫৩।
১২. তদেব, পৃ. ৫০।
১৩. তদেব, পৃ. ৫১।
১৪. তদেব, পৃ. ৫১।
১৫. কেম্প স্মিথ, নরম্যান. *ইম্যানুয়েল কান্টস্ ক্রিটিক অফ পিউর রিজন.* লণ্ডনঃ ম্যাক মিলান এণ্ড কোং, ১৯২৯, পৃ. ৭।

১৬. তদেব, পৃ. ৪ ।
১৭. তদেব, পৃ. ৭।
১৮. তদেব, পৃ. ৭।
১৯. তদেব, পৃ. ৭।।
২০. তদেব, পৃ. ১০।
২১. কেম্প স্মিথ, নরম্যান. *এ কমেন্টারি টু ইম্যানুয়েল কান্টস্ ক্রিটিক অফ পিউর রিজন.* লণ্ডনঃ ম্যাক মিলান এণ্ড কোং, ১৯২৯, পৃ. ৭৫।
২২. তদেব, পৃ. ৭৫।
২৩. তদেব, পৃ. ১৪।
২৪. তদেব, পৃ. ২৯।
২৫. তদেব, পৃ. ৫৬।